বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায়
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবদান

[বাংলা - Bengali - البنغالية]

লেখক: ড. মোঃ আবদুল কাদের

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2011- 1432

﴿ دور محمد ﷺ في تأسيس حقوق الإنسان ﴾

« باللغة البنغالية »

محمد عبد القادر

مراجعة: د. أبو بكر محمد زكريا

2011- 1432

IslamHouse.com

মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবদান

ভূমিকা:

সাম্প্রতিককালে বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার প্রসঙ্গটি নানাভাবে আলোচিত-সমালোচিত হচ্ছে। মানবাধিকারের মানদণ্ড, সমাজভেদে তার প্রয়োগগত সংজ্ঞা, সীমা ও ব্যাখ্যা সম্পর্কেও তৈরি হচ্ছে নানা বিতর্ক। মানবাধিকার রক্ষা বা প্রতিষ্ঠায় উন্নত দেশসমূহের গৃহীত পদক্ষেপ উন্নয়নশীল সমাজে প্রকৃতপক্ষে মানুষের মূল্য মর্যাদার ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক নাকি অধিকার হরনের নতুন পন্থা সে সম্পর্কেও উন্নত, উন্নয়নশীল সব সমাজেই চলছে ব্যাপক আলোচনা। প্রাসঙ্গিকভাবেই জাতিসংঘের বিশ্ব মানবাধিকার ঘোষণার বিষয়টি সেসব আলোচনা, সমালোচনায় চলে আসছে। কিন্তু অনেকের হয়ত ধারণা নেই, মানবিক মূল্য-মর্যাদা তথা মানবাধিকারের ব্যাপক বিস্তৃতি বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা ও প্রায়োগিক উদাহরণের মাধ্যমে একটি অনুসরণযোগ্য সার্বজনীন আদর্শ সেই সপ্তম শতাব্দীর শুরুতেই একজন মহাপুরুষ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অত্যন্ত সফলভাবে। তিনি বিশ্ব মানবতার মুক্তিদূত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। আজকের প্রেক্ষাপটে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সেসব মানবতাবাদী নীতি-দর্শন নতুন করে অধ্যয়ন ও পর্যালোচনার দাবী রাখে। কারণ তাতে হয়ত দেখা যাবে সমকালীন বিশ্বে মানুষের সার্বজনীন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সেসব নীতি-দর্শনের প্রয়োগ কেবল গ্রহণযোগ্য বা প্রয়োগ উপযোগীই নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে একান্ত আবশ্যকীয়। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর সেসব যুগান্তকারী সুদূরপ্রসারী দর্শনের প্রধান কতকগুলো দিক সম্পর্কে আলোচনা করব।

মানবাধিকার ধারণা এবং তার বিকাশ

মানুষকে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, জাতি, ধন-সম্পদ, জেন্ডার নির্বিশেষে সমভাবে দেখে তার সহজাত ও স্রষ্টা প্রদত্ত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করাই হচ্ছে 'মানব মর্যাদা'। মানুষের অস্তিত্ব ও স্বকীয়তা রক্ষা, সহজাত ক্ষমতা ও প্রতিভার সৃজনশীল বিকাশ ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের অধিকারকে সমুন্নত রাখার জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয় কতিপয় অধিকার স্বত্বই হচ্ছে 'মানব মর্যাদা'। মানুষের এই অধিকার তার জন্মগত এবং মানবিক মূল ও মর্যাদার সাথে সংশ্লিষ্ট। Encyclopaedia Britannica-তে মানবাধিকারকে প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত মানুষের জন্মগত অধিকার হিসাবে দেখা হয়েছে। বলা হয়েছে,

"Rights thought to belong to the individual under natural law as a Consequence of his being human"।[1]

মানবাধিকার কেবলমাত্র মানুষের মৌল-মানবিক চাহিদা (Basic human needs) এর পূরণই নয় বরং তা হচ্ছে মানুষের সামগ্রিক উন্নয়ন, প্রতিভার বিকাশ, চিন্তা (thoughts), বিশ্বাস (believe) ও সৃজনশীলতার লালন সমকালীন বিশ্বে মানবাধিকারের এই ধারণা বিকাশ লাভ করেছে প্রধানত পশ্চিমা বিশ্বের রাষ্ট্র ও সমাজনীতি এবং বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিকবাদের আন্তরাষ্ট্রীয় পরিমন্ডলে জাতিসংঘের উদ্যোগে।

পশ্চিমা সভ্যতায় মানবাধিকারের প্রথম স্বীকৃত দলীল হচ্ছে 'ম্যাগনাকার্টা' (Magna Carta)। হস্তলিখিত ল্যাটিন ভাষার এই দলিলে ১২১৫ সালে ইংলান্ডের রাজা জন স্বাক্ষর দেন যাতে রাজার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা হয়েছিল এবং সাধারণ পরিষদের অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল।[2] ম্যাগনাকার্টা অবশ্য সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়নি এবং তার ফলেই বহু বছর পর ১৬৮২ খ্রিস্টাব্দে 'Petition of Rights' এর জন্ম হয়। রাজা প্রথম চার্লস অনিচ্ছা সত্ত্বেও পিটিশন অব রাইটস মেনে নেন তবে তা ম্যাগনাকার্টার বর্ণিত মানবাধিকার বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে Verginia-তে "Bill of Rights" গৃহীত হয়-যেখানে রাজার ক্ষমতা হ্রাস করে জনগণের প্রতিনিধিদের ক্ষমতা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।[3] কিন্তু এই বিল অব রাইটসও সকলের জন্য মৌল মানবাধিকারের দাবীর প্রতিফলন ঘটাতে ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৭৭৬ সালে প্রথমবারের মত লিখিত দলিলে এ ধরনের মৌল-মানবিক অধিকার স্থান পায় মার্কিন জাতির জনক জর্জ ওয়াশিংটন ও তার সহকর্মীদের 'আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রে'।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এসব আন্তর্জাতিক দলিলের ও পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতির আলোকে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠাকালে ঘোষিত হলো যে, এ প্রতিষ্ঠানটি "মৌল-মানবিক অধিকার, মানুষের মর্যাদা ও মূল্য এবং ছোট-বড় জাতি, ধর্ম-বর্ণ ও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকারের প্রতি এই সংস্থা পুনরায় আস্থা রাখার অঙ্গীকার করেছে।"[4]

---

1. The New Encyclopaedia Britannica, Funded in 1768, 15th edition, printed in U.S.A., vol. 5, p. 200.
2. The World Book of Encyclopaedia, vol. ২, P. ৪৭০৯.
3. প্রাগুক্ত, vol. ১৩, পৃ. ৬২৪০।
4. উদ্ধৃত, আবু সাঈদ চৌধুরী, মানবাধিকার, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ভাষা-শহীদ গ্রন্থমালা, ২য় প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৮৮, পৃ. ১২।

১৯৪৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী তারিখে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন গঠন করে এবং এই কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর ফ্রান্সের প্যারিসে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সাধাণ পরিষদের অধিবেশনে বিশ্ব মানবাধিকার ঘোষণা গৃহীত হয়। এই সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা, যা ''সকল জাতির এবং মানুষের অর্জনের সাধারণ মানদণ্ড'' ইহসাবে গৃহীত হয় এই দর্শনের উপর ভিত্তি করে যে: ''সকল মানুষই বন্ধনহীন অবস্থায় এবং সম-মর্যাদা ও সমঅধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাদের বুদ্ধি ও বিবেক দেয়া হয়েছে এবং তাদের উচিত ভ্রাতৃসুলভ মনোভাব নিয়ে একে অন্যের প্রতি আচরণ করা।"[5] সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় মো ৩০টি ধারা আছে। এর মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে '' এমন একটি সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি করা যাতে করে সকল মানুষ ও জাতি জীবন নির্বাহের একটি সর্বজনস্বীকৃত মাপকাঠি খুঁজে পায়। মানবাধিকার ঘোষণায় এর জন্য মূল জোর দেওয়া হয়েছে সাম্যের নীতির উপর।''[6]

বিস্ময়করভাবে দেখা যায় মানবাধিকারের এই ঘোষণার প্রায় সাড়ে তেরশত বছর আগেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল মদীনায়। সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নেতৃত্বে এবং পরবর্তীতে খলিফাবৃন্দের শাসনামলে, আরবে মানবিক মর্যাদা ও মানবাধিকারের যে উন্নত কাঠামো সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, পর্যালোচনা ও তুলনামূলক বিশ্লেষণে নিঃসন্দেহে দেখা যাবে সেটিই ছিল পৃথিবীর প্রথম এবং পূর্ণাঙ্গ পরিশীলিত মানবাধিকার ধারণা (concept of human rights) ও তার বাস্তবপ্রয়োগ (application)। বিষয়টি ব্যাপক আলোচনা এবং তথ্যনির্ভর গবেষণার দাবী রাখে যা সময় সাপেক্ষ এবং বর্ধিত কলেবরের ব্যাপার। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা কেবল এক্ষেত্রে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অবদান সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার অবতারণা করব।

মানবমর্যাদা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নবুয়ত প্রাপ্তির অনেক আগ থেকে তাঁর উত্তম চরিত্রাদর্শ ও মানবিক গুণাবলীর জন্যে বিখ্যাত হয়েছিলেন। ঐতিহাসিকরা যে সময়কে 'জাহেলিয়াতের বা অন্ধকার যুগ' বলেছেন সেই সময়ে জন্মলাভ করেও ঝগড়া-বিবাদ, নরহত্যা, সম্পদ লুণ্ঠন, ব্যভিচার ইত্যাদি অকল্যাণকর, মানবতার জন্যে চরম অবমাননাকর কর্মকাণ্ডে তিনি কখনো জড়িত হননি। অথচ তখনকার সমাজে যে কোন যুবকের জন্যে তা ছিল স্বাভাবিক। বরং তিনি ছিলেন এতিম, অসহায়, নির্যাতিতদের

---

5 . এম. এরশাদুল বারী, মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৪৩, জুন ১৯৯২, পৃ. ৩।

6 . আবু সাঈদ চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬।

একমাত্র সহায়, সান্ত্বনাদানকারী, ধন-সম্পদের আমানতকারী এবং অনেকক্ষেত্রে আশ্রয়দাতা। চুরি-ডাকাতির ভয়ে ভীত, আতঙ্কিত মানুষ তাঁর কাছে হাজির হয়ে তাদের মূল্যবান সম্পদ আমানত করে যেত, আর তিনি সেই আমানতের যথাযথ হেফাযত করতেন এবং যথারীতি তা ফেরত দিতেন। এভাবে নবুয়ত লাভের অনেক আগেই আরববাসী তাঁকে 'আল-আমীন' বা 'পরম বিশ্বস্ত' খেতাবে ভূষিত করেছিল।[7] নবুওয়াত লাভের পাঁচ বছর পূর্বে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ৩৫ বছর বয়সে পবিত্র ক্বাবা শরীফ মেরামতকালে সেখানকার কালো পাথর 'হাজরে আসওয়াদ' স্বস্থানে তুলে নেয়ার ব্যাপারে যখন কলহ-দ্বন্দের সূত্রপাত হয় এবং প্রত্যেক গোত্রই এই কাজ করে মর্যাদা লাভের প্রতিযোগিতায় যুদ্ধোন্মুখ হয়ে পড়ে তখন সেই গুরুতর সমস্যার মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি এমন একটি সমাধান দেন যাতে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মর্যাদাই রক্ষিত হয়েছিল। সকলেই সন্তুষ্ট চিত্তে সে ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিল আর তা ছিল একটি চাদরের মাঝখানে পাথরটি রেখে আরদিকে গোত্রপতিদের দিয়ে চাদরটি ধরে যথাস্থানে নিয়ে যাওয়া ও সবশেষে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিজ হাতে সেটিকে প্রতিস্থাপন করা।

সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা, মানবিক মূল্যবোধকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়ার এই উদাহরণ তাঁর জীবনের শুরু থেকেই আজীবন নানাভাবে দেখা গিয়েছিল। পরবর্তীকালে যখন তিনি গোটা আরব জাহানের নেতা হয়ে উঠলেন তখন তিনি কি সমাজজীবনে, কি পারিবারিক জীবনে, কি রাষ্ট্রীয় তথা নাগরিক জীবনে, কি বিশ্ব নাগরিক হিসাবে-সর্বক্ষেত্রে মানুষের মূল্য-মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকারেরর যে সার্বজনীন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন আজ পর্যন্ত সারা বিশ্বের ইতিহাসে তা বিরল, অভূতপূর্ব। তাঁর প্রতিষ্ঠিত নীতি-দর্শনের কয়েকটি দিকের উপর আলোকপাত করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

মানুষের বেঁচে থাকার ও নিরাপত্তা লাভের অধিকার

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানুষের জীবনে অধিকার ও জান-মালের নিরাপত্তা বিধানের ব্যাপারে সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেছেন। নরহত্যা যেখানে নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল সেখানে নরহত্যাকে জঘন্য অপরাধ হিসাবে আখ্যায়িত করে বলেছেন ''সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে কাউকে অংশীদার বানানো এবং মানুষকে

7 . মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইফাবা, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৭, পৃ. ৭।

হত্যা করা।"[8] মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেছেন: "কোন মু'আহীদকে (মুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থানরত চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিককে) হত্যাকারী জান্নাতের সুঘ্রাণ পর্যন্ত পাবে না। যদিও জান্নাতের সুঘ্রাণ ৪০ বছর দূরত্ব থেকে পাওয়া যায়।"[9] বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে (যাকে মানবাধিকারের আদি সনদ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়) মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "হে মানবজাতি! নিশ্চয়ই তোমাদের জীবন, সম্পদ এবং সম্ভ্রম তোমাদের প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত (অবৈধ হস্তক্ষেপ থেকে) পবিত্র।"[10] মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আত্মহত্যাকে নিষিদ্ধ করেছেন এবং আত্মহত্যাকারী তার নিজের জীবন নিজেই শেষ করে দেয়ার শাস্তি হিসাবে আত্মহত্যার অনুরূপ পন্থায় দোযখে শাস্তিভোগ করবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।[11]

বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন- "হে মুসলিমগণ! আমার পরে তোমরা কাফেরদের কার্যকলাপে লিপ্ত হইও না যে তোমরা একে অপরকে হত্যা করিতে আরম্ভ কর।"[12]

ইসলামের অভ্যুদয়ের বহু আগ থেকে বিশেষত আরবে নবজাতক বিশেষ করে মেয়ে শিশুদের জন্মলাভের পরপরই দারিদ্রের ভয়ে হত্যা বা জীবন্ত প্রোথিত করার রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইসলামী সমাজে শিশু হত্যার এ জঘন্য প্রবণতাকে দণ্ডযোগ্য অপরাধ ঘোষণা করে পবিত্র কুরআনের প্রত্যাদেশের মাধ্যমে[13] শিশুদের জীবনের অধিকার ও নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করা হয়। জীবনের অধিকারকে হরণ করা হয় বলে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গর্ভপাতকেও অনুমোদন দেননি; বরং একে ফৌজদারী আইনের আওতায় দণ্ডযোগ্য অপরাধ হিসাবে

---

8 . আল্-হাদীস, উদ্ধৃত, M. Ershadul Bari, Human Rights in Islam with Special Reference to Women's Right, Internationa Human Rights in Islam-শীর্ষক সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ, ৫ অক্টোবর ১৯৯৪, সোনারগাঁ হোটেল, ঢাকা, পৃ. ১৮।

9 . আল্-হাদীস, বাংলায় বোখারী শরীফ হাদীসসমূহ, মোঃ আবদুল করিম খান সংকলিত, বাংলাদেশ লাইব্রেরী, ঢাকা, ৪র্থ সংস্করণ-১৯৯৬, পৃ. ৩৩০, হাদীস নং ১২৭৭।

10 . উদ্ধৃত, মুহাম্মদ শফিক আহমদ ও মুহাঃ রুহুল আমীন, ইসলামে মানবাধিকার, নাগরিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, যুক্তসংখ্যা ৪৭, ৪৮, অক্টোবর '৯৩-জুন '৯৪, পৃ. ১৫৮।

11 . দ্রষ্টব্য, বাংলায় বোখারী শরীফ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১২৫১-১২৫৩।

12 . প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১২৫৪।

13 . কুরআনে বলা হয়েছে, "দারিদ্রের ভয়ে তোমাদের সন্তানকে হত্যা করো না, তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমি জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা করা এক জঘন্য অপরাধ"-সূরা বণী ইসরাইল : ৩১।

গণ্য করেছেন।[14] এভাবে মানুষের জীবন রক্ষার অধিকারকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

বিবাহ ও পরিবার গঠনের অধিকার

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবন দর্শনে সমাজে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যক্তিকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অধিকার প্রদান করা হয়েছে। ইসলামে বিবাহ সমভাবে একটি অধিকার ও ধর্মীয় দায়িত্ব। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "বিবাহ আমার পন্থা, যে আমার পন্থার প্রতি অনাসক্ত হয় সে আমার আদর্শভূক্ত নয়।"[15] কৌমার্যব্রতকে প্রত্যাখান করে তিনি বলেছেন: "ইসলামে সন্ন্যাসব্রত বা বৈরাগ্যপ্রথার অনুমোদন নেই।"[16] প্রকৃতপক্ষে ইসলামে 'বিবাহ' কেবলমাত্র জৈবিক চাহিদা পূরণের পন্থাই নয়, বরং পারস্পারিক ভালবাসা, সমঝোতা, সমবেদনা ও নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রবর্তিত বিবাহ ব্যবস্থা এমন একটি সামাজিক চুক্তি যাতে নারী ও পুরুষ উভয়ের সম্মত বা অসম্মত হবার সমান অধিকার স্বীকৃত। তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারেও ইসলামে নারী ও পুরুষকে সমান অধিকার প্রদান করা হয়েছে।

বিবাহের পাশাপাশি পারিবারিক জীবনকে ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। 'যেহেতু স্বামী-স্ত্রীই হল পরিবারের মূল ভিত্তি এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কের উপরই প্রাথমিকভাবে পারিবারিক জীবনের শান্তি ও সুখ নির্ভর করে তাই পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কেমন হবে এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিয়ে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে: "তাঁরা (স্ত্রীগণ) হবে তোমাদের (স্বামীদের) ভূষণ আর তোমারা (স্বামীগণ) তাদের (স্ত্রীদের) ভূষণ" (সূরা বাকারাহ : ১৮৭)। একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে এই পারিবারিক জীবনে মানবাধিকার ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাসহ শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কতখানি সতর্ক ছিলেন তা তাঁর নিম্নোক্ত হাদীস দু'টিতে প্রস্ফুটিত হয়। তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই (সে সত্যানুসারীদের অন্তর্ভূক্ত নয়)। তিনি আরো বলেছেন, "সকল মানুষ আল্লাহর পৌষ্য (পরিবারের সদস্যের ন্যায়), সে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় যে তাঁর পৌষ্য (মানুষের প্রতি)

---

14 . বিস্তারিত দেখুন: গাজী শামছুর রহমান, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ফৌজদারী আইনের সংশোধন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯২, ইফাবা, পৃ. ৩০৩-৩০৪।

15 . আল্-হাদীস, উদ্ধৃতি : মুহাম্মদ শফিক আহমদ ও মুহাম্মদ রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩।

16 . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩।

সর্বাধিক সদ্ব্যবহার করে।[17] মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর নিজের পারিবারিক জীবনে এসব আদর্শের বাস্তব প্রতিফলন দেখিয়েছেন অত্যন্ত সফলভাবে।[18]

সম্পত্তির মালিকানার অধিকার

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রবর্তিত ইসলামী অর্থব্যবস্থা সমাজতন্ত্রবাদ বা পুঁজিবাদ কোনটিকেই পুরোপুরি সমর্থন করে না বরং তা একটি কল্যাণ রাষ্ট্রীয় ধারণাকে সমর্থন করে। এখানে ব্যক্তির জন্য সম্পত্তির অপ্রকৃত মালিকানা স্বীকৃত। তবে তা এতটাই নিয়ন্ত্রিত যে, ব্যক্তি এখানে সম্পদ উপার্জনের লাগামহীন স্বাধীনতা লাভ করে না। ইসলামী সমাজে সকল সম্পদের প্রকৃত মালাকানা আল্লাহর। মানুষ দায়িত্বপ্রাপ্ত (trustee) হিসাবে এর অর্জন, ভোগ ও বণ্টনের অধিকার লাভ করে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "তাদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।"[19] দান, খয়রাত, সদকা, যাকাত, ফিতরা প্রভৃতির মাধ্যমে বর্ধিত সম্পদের বিলি-বণ্টন করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক অবস্থার কথা কেবল বলাই হয়নি, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর জীবনে কার্যকরভাবে তা প্রতিষ্ঠাও করেছেন। ইসলামী সমাজে পুঁজিপতি ও শ্রমিকের সম্পর্ক শোষণ বা সংঘর্ষ নির্ভর নয় বরং পারস্পরিক কল্যাণমূলক ও ভ্রাতৃত্বসুলভ। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "যে সত্তার হাতে আমার জিবন তার শপথ করে বলছি, কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণমাত্রায় মু'মিন হতে পারে না, যে পর্যন্ত না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তার অন্য ভাইয়ের জন্যও তা পছন্দ করে।"[20] তিনি আরো বলেছেন, "শ্রমিককে তার শ্রমোৎপন্ন লভ্যাংশ দান কর। কারণ আল্লাহর শ্রমিককে কিছুতেই বঞ্চিত করা যায় না।"[21] তিনি প্রতারণা, চৌর্যবৃত্তি, ডাকাতি ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পদ হস্তগতকরণ, বাজারে একচেটিয়া অধিকার লাভ, কালোবাজারী, সংকট সৃষ্টি কিংবা কৃত্রিমভাবে মূল্যবৃদ্ধির জন্য পণ্যদ্রব্য মজুতকরণ, সুদের ভিত্তিতে ঋণদান বা লোকসানের চুক্তি ব্যতীত লভ্যাংশ গ্রহণকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

---

17 . উদ্ধৃত, ড. আ. ন. ম. রইছ উদ্দিন; বিভিন্ন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবারের শিক্ষা ও মূল্যবোধ : ইসলাম ধর্ম, আদর্শ পরিবার, উন্নত সমাজ, কারিতাস উন্নয়ন শিক্ষা কার্যক্রমের দ্বিমাসিক মুখপাত্র, সংখ্যা ৪১, ১৪ বর্ষ, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪, পৃ. ৬২।

18 . বিস্তারিত দেখুন, কুরআন হাদীসের আলোকে পারিবারিক জীবন, মূল : মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) অনুবাদ : মাওলানা আবু তাহের রাহমানী, বাগদাদ লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯৯।

19 . আল-কুরআন, সূরা মা-আরিজ : ২৪-২৫।

20 . আল্-হাদীস, উদ্ধৃতি : মুহাম্মদ শফিক আহমদ ও মুহাম্মদ রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫।

21 . আল্-হাদীস, উদ্ধৃতি : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫।

করেছেন। অন্যদিকে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিককে উত্তরাধিকার আইনের মাধ্যমে সম্পদ কিংবা স্থানান্তরিত করার অধিকার প্রদান করেছেন।[22]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের উৎস ছিল পাঁচটি এবং সেই আয়ে সকল নাগরিকের অধিকার স্বীকৃত ছিল। এ উৎসগুলো হচ্ছে: ১. দান, ২. মালে গণিমত : নগদ অর্থ বা দ্রব্য সামগ্রী (যা যুদ্ধ জয়ের ফলে পাওয়া যেত), ৩. যুদ্ধ জয়ের মালামাল : ভূ-সম্পত্তি, ৪. জিজিয়া কর ও ৫. সাদাকাহ। এসব উৎস থেকে সম্পদ আহরণের ব্যাপারে যেমন কঠোরতা ও ন্যায়নীতির আশ্রয় নেয়া হতো তেমনি এসব সম্পদ বিতরণের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত সতর্কতা ও নাগরিক অধিকারের প্রতি সুবিচার অবলম্বন করা হতো। গণিমতের মাল বিতরণের সময় নিজের প্রাণপ্রিয় কণ্যার সামান্য অনুরোধ বা আবদার রক্ষা করাকেও তিনি রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের কারণে উপেক্ষা করেছেন।

দাসত্ব থেকে স্বাধীনতার অধিকার

দাসত্বের পরাধীনতা মাবেতিহাসের এক চরম অমানবিক ও অবমাননাকর অধ্যায়। এর প্রচলন ছিল বিশ্বব্যাপী এবং ১৮৯০ সালে ব্রাসেলসে দাস-ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ কনফারেন্সের পূর্ব পর্যন্ত বিশ্বের কোথাও এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচারণ করা হয়নি। "মানব প্রকৃতি অপরিবর্তনীয়" এ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে প্লেটো ও এরিস্টটল থেকে শুরু করে আঠারো শতকের অধিকাংশ দার্শনিক দাসপ্রথাকে সমর্থন করেছেন।

গ্রীক, রোমান, পারসিক প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতাসমূহে ইহুদী, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও সনাতন হিন্দু ধর্মে এমনকি আধুনিক ইউরোপ ও আমেরিকাতেও প্রথমদিকে দাস প্রথা স্বীকৃত প্রথার মর্যাদা পায়।"[23] এ থেকে অনুমিত হয় যে, এ প্রথাটির নৈতিকতা সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির প্রাথমিক কৃতিত্ব মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এরই প্রাপ্য।

মানবতার মুক্তিদূত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই সপ্তম শতাব্দীতেই এ প্রথার বিরোধিতা ও এর বিলুপ্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। এখানে তাঁর দর্শন ছিল : সমগ্র মানব জাতি একজন নারী ও পুরুষ থেকে উদ্ভূত, সুতরাঙ জন্মগতভাবে সকল মানুষ সমান ও স্বাধীন। "ইসলামের আবির্ভাব কালে, ... কৌশলগত কারণে ও নিরাপত্তার স্বার্থে ইসলাম সাময়িকভাবে যুদ্ধবন্দীগণকে দাস-দাসীরূপে গ্রহণের বিষয়টি অনুমোদন করে। তবে, তাও এ শর্তসাপেক্ষে ছিল যে, এক. অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্বক মুক্তকরণ, দুই. মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তকরা, তিন. বন্দী বিনিময়ের মাধ্যমে

---

22 . আল-হাদীস, উদ্ধৃতি : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫।

23 . উদ্ধৃতি : মুহাম্মদ শফিক আহমদ ও মুহাম্মদ রুহুল আমীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০।

মুক্তকরণ। যখন এ তিনটি ব্যবস্থার কোনটির মাধ্যমে বন্দীমুক্তি সম্ভব হবে না কেবলমাত্র তখনই যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস-দাসী হিসেবে গ্রহণ করা যাবে।"[24] রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসৃত এ নীতির মূলে ছিল পবিত্র কুরআনের এই নির্দেশ: "তোমরা যখন তাদেরকে (শত্রু পক্ষকে) পরাভূত করবে তখন তাদের বন্দী করবে। অতঃপর অনুগ্রহ প্রদর্শণপূর্বক কিংবা মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্ত করে দিবে।"[25] এ নীতির আলোকে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রবর্তিত ইসলামী রাষ্ট্রে গৃহীত কতকগুলো অভূতপূর্ব ব্যবস্থা সকল ধরনের দাস-দাসীর পুনরুদ্ধারের পথ খুলে দিয়েছিল, যাতে কিছুদিনের মধ্যে দাস প্রথা প্রকৃত অর্থে বিলুপ্ত হতে পারে। এগুলো হচ্ছে:

১. তাকতিব : এমন লিখিত দলীল যার মাধ্যমে দাস-দাসীরা তাদের স্বাধীন বৃত্তির দ্বারা উপার্জিত সম্পদের বিনিময়ে স্বাধীন হতে পারে; ২. তাদবির : দাসপতির মৃত্যুর পর স্বাধীনতা লাভের অধিকার সম্পর্কিত চুক্তি, ৩. ইসতিলাদ : প্রভুর সন্তান জন্মদান হেতু স্বাধীনতা লাভের অধিকার সম্পর্কিত আইনগত ব্যবস্থা[26], ৪. প্রভূ কর্তৃক গর্ভবতী হয়ে কোন দাসী কোন সন্তান প্রসব করলে সে সন্তান স্বাধীন মানুষের মর্যাদা লাভ করত; ৫. পিতা দাস হওয়া সত্ত্বেও একজন স্বাধীন নারীর গর্ভজাত সন্তান স্বাধীন হিসাবে স্বীকৃত হতো; ৬. যতদিন পর্যন্ত দাস প্রথা প্রচলিত ছিল ততদিন ইসলামী আইনে বিভিন্ন অপরাধের কাফ্ফারা হিসাবে দাস মুক্তির বিধান রাখা হয়েছিল এবং ৭. দাসদাসীদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যাকাতের অর্থ ব্যয় করার আইনগত ব্যবস্থা ঘোষিত হয়। এসব আইনগত বিধানের পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাস-দাসী মুক্তির বিষয়টি অত্যন্ত পূণ্যের কাজ এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উপায় হিসেবে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেছেন, "যে মুসলিম একজন বিশ্বাসী দাস-দাসীকে মুক্ত করবে আল্লাহ মুক্ত দাস-দাসীর প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে দাসপতির প্রতিটি অঙ্গকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।"

তিনি আরো বলেন: "যে ব্যক্তি স্বীয় দাসীকে শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত করার পর মুক্ত করে বিবাহ করবে সে দিগুণ সওয়াব পাবে ...।" বলা বাহুল্য, মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এসব বাণী ও নীতিমালার ফলে বহু দাস-দাসী তাদের দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে। "স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাতষট্টি, আবূ বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) অসংখ্য, আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সত্তর, ওসমান (রাদিয়াল্লাহু

---

24 . উদ্ধৃতি : প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১।

25 . আল্-কুরআন, সূরা মুহাম্মাদ : ৪।

26 . এখানে উল্লেখ্য যে, এমনকি অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ পর্যন্ত, আমেরিকা ও ফ্রান্সে কোন দাসীকে বিয়ে করার অপরাধে স্বাধীন পুরুষকেও তার সকল নাগরিক অধিকার হারাতে হত।

আনহু) বিশ, হাকীম ইব্‌ন হিযায (রাদিয়াল্লাহু আনহু) একশত, ইবন ওমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এক হাজার, আব্দুর রহমান ইবন আউফ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ত্রিশ হাজার দাসদাসীকে স্বাধীনতা দান করেন।[27] রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দাস প্রথা বিরোধী এসব নীতিমালা ও সক্রিয় নেতৃত্বের সুদূর প্রসারী ফল হিসাবে "খলীফাদের আমলে আরবের সকল দাস-দাসী স্বাধীনতা লাভ করে এবং আরবের দাসপ্রথার সমাধান এভাবে চল্লিশ বছরের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছিল।"[28]

স্বাধীনভাবে চলাচল, বসবাস, রাজনৈতিক আশ্রয় ও নাগরিকত্ব লাভের অধিকার

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রবর্তিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিককে রাষ্ট্রের যে কোন স্থানে স্বাধীনভাবে চলাচল ও বসবাসের অধিকার প্রদান করে। একই ভাবে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের বাইরে যাওয়া ও অন্য রাষ্ট্রে বসবাসের অধিকারও প্রতিটি ব্যক্তিকে দেয়া হয়েছিল। তাঁর রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে একটি 'বিশ্ব রাষ্ট্রব্যবস্থা' ধারণায় বিশ্বাসী ছিল। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রাষ্ট্রদর্শন অনুযায়ী সমগ্র বিশ্ব আল্লাহর রাজ্যস্বরূপ- যা তিনি সকল মানুষের চলাচল ও বসবাসের জন্যে অবারিত করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, "সমগ্র দেশ আল্লাহর আর মানুষ আল্লাহর বান্দা, তুমি যেখানে মঙ্গলজনক মনে কর বসবাস কর।"[29] এখানে উল্লেখ্য যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত মানুষের জন্য বিশ্বের যে কোন স্থানে স্বাধীনভাবে চলাচল ও বসবাসের সর্বজনীন স্বাধীনতা ছিল।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রবর্তিত ইসলামী রাষ্ট্রে ধর্ম, বর্ণ, মতাদর্শ নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যক্তিকে 'ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হবে না'-এ শর্তে রাজনৈতিক আশ্রয় ও নাগরিকত্বের অধিকার দেয়া হয়েছে। মদিনা প্রজাতন্ত্রে মক্কা থেকে হিজরতকারী মোহাজির জনগণকে আশ্রয় ও নাগরিকত্ব প্রদানসহ অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে পুনর্বাসিত করা হয়েছিল। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নেতৃত্বে ইসলামী রাষ্ট্র আশ্রয় প্রার্থীদের মৌলিক চাহিদা পূরণার্থে রাষ্ট্রীয় সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ বরাদ্দ করে তাদেরকে স্বাবলম্বী করে তোলার প্রশংসনীয় উদ্যোগ নেয়।[30]

---

27 . মুহাম্মাদ আবুল হাসান থেকে উদ্ধৃত করেছেন মুহাম্মদ শফিক আহমদ ও মুহাম্মদ রুহুল আমিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩।

28 . উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩।

29 . আল্-হাদীস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১।

30 . আল্-হাদীস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২।

নিপীড়ন-নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা ও অমানবিক আচরণ থেকে মুক্তি লাভের অধিকার

শান্তিপূর্ণ পরিবেশে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কোন ব্যক্তিকে শারীরিক-মানসিক শাস্তিদান বা তাকে কষ্ট দেয়াকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি বলেছেন, "প্রকৃত মুসলিম হচ্ছে সে ব্যক্তি যা কথা বা হাত (কাজের নিপীড়ন) থেকে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকেন।"[31] এমনকি এক্ষেত্রে অমুসলিম নাগরিকগণের অধিকার সম্পর্কে অত্যন্ত দৃঢ় ভাষায় তিনি বলেছেন: "মনে রেখো! যদি কোন মুসলিম অমুসলিম নাগরিকের উপর নিপীড়ন চালায়, তার অধিকার খর্ব করে, তার উপর সাধ্যাতীত বোঝা (জিযিয়া বা প্রতিরক্ষা কর) চাপিয়ে দেয় অথবা তার কোন বস্তু জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয় তাহলে কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহর আদালতে তার বিরুদ্ধে অমুসলিম নাগরিকের পক্ষ অবলম্বন করব।"[32]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কারো অপরাধের জন্য অন্যকে দণ্ড দেওয়ার যুগ যুগ ধরে প্রচলিত রেওয়াজও চিরতরে রহিত করে দেন। বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক অভিভাষণে তিনি বলেন, "কারো অপরাধের জন্য অন্যকে দণ্ড দেয়া যাবে না। সুতরাং পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে এবং পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে দায়ী করা যাবে না।"[33] রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই ঘোষণার মূলে ছিল কুরআনের সেই বাণী, "প্রত্যেক ব্যক্তি তার কৃতকর্মের জন্য দায়ী। যে ব্যক্তি কোন অপরাধ সংগঠিত করে তা তারই দায়িত্বে থাকে, কেউ অন্যের বোঝা বহন করে না।"[34] এছাড়াও "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও খলীফাদের শাসনামলে এমন বহু ঘটনা রয়েছে যাতে আইনগত প্রতিবিধানের ব্যবস্থা বা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দান ব্যতীত কাউকে আটক করার ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।"[35]

সাম্প্রতিককালে দেখছি মানবাধিকার সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর হাতেও আমরা যুদ্ধবন্দীদের উপর কি বিভৎস, অমানবিক ও নিষ্ঠুর অত্যাচার, নির্যাতন চলছে- অথচ এ ব্যাপারে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নীতি প্রকৃত

---

31 . আল্-হাদীস, ওয়ালী উদ্দিন মোহাম্মদ ইবনু আব্দুল্লাহ, মিশকাত আল মাসাবিহ, এম. বশির হাসান এন্ড সন্স, কলিকাতা, তা. বি. ১ম খণ্ড, পৃ. ১২।

32 . আল্-হাদীস থেকে উদ্ধৃত, মো. আতাউর রহমান, ইসলামী শ্রমনীতির রূপরেখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৪৬, জুন- '৯৩, পৃ. ৪৩।

33 . আল্-হাদীস, ইবনু মাজা ও তিরমিযী, মাওলানা আকরাম খাঁ প্রণীত, মোস্তফা চরিত, ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ৮৫৫।

34 . আল্-কুরআন, সূরা তূর : ২১ ও সূরা আনআম : ১৬৪।

35 . মুহাম্মদ শফিক আহমদ ও মুহাম্মদ রুহুল আমিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪।

মানবাধিকার সংরক্ষণে কত কার্যকর। তিনি বলেছেন, "মুসলিমদের প্রতি মুসলিমদের যে কর্তব্য, আশ্রয়প্রার্থী ও যুদ্ধবন্দিদের প্রতি কর্তব্য তার চেয়ে অনেক বেশি।"[36] ইবনে রুশদ সাহাবী আল হাসান ইবনে মুহাম্মদ আল তামিমির বরাত দিয়ে বলেন, "রাসূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবীরা সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বন্দীকে হত্যা করা বে-আইনী"। বদর যুদ্ধে প্রাপ্ত যুদ্ধবন্দিদের সঙ্গে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে আদর্শ ব্যবহার দেখিয়েছিলেন জগতের ইতিহাসে তাঁর তুলনা মেলা ভার। তাঁর আদেশে মদীনার আনসার এবং মুহাজিররা সাধ্যানুসারে বন্দিদের নিজেদের মধ্যে ভাগ করে আপন আপন গৃহে স্থান দিয়েছিলেন এবং আত্মীয়-স্বজনের মত তাদের সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর এই নীতি যুদ্ধবন্দিদের জীবনে মানবাধিকার এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিল যে, পরবর্তীকালে উইলিয়াম মূর 'লাইফ অব মুহাম্মাদ' গ্রন্থে লেখেন যে, "মুহাম্মাদের নির্দেশানুযায়ী বন্দি এবং স্থানীয়রা একই বাড়িতে স্থান পেয়েছিলেন, তারা বন্দিদের দয়া এবং সহানুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করেন ...।"[37]

অবাধ ও স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার অধীনে ন্যায়বিচার লাভের অধিকার

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রবর্তিত রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক-সামাজিক-পেশাগত মর্যাদা নির্বিশেষে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক একটি নিরপেক্ষ, অবাধ ও স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার অধীনে স্বাভাবিক ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার লাভ করে। মূলত ন্যায় বিচার ধারণার উপর ইসলামে এতটা গুরুত্ব আরোপ করা হযেছে যে, কুরআনে প্রায় ষাটটি আয়াতে এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন একটি আয়াতে বলা হয়েছে, "তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক এবং আল্লাহর জন্য ন্যায় সঙ্গত সাক্ষ্য দাও, তাতে যদি তোমাদের পিতা-মাতা কিংবা আত্মীয়-স্বজনদের ক্ষতি হয় তবুও।"[38] রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতিষ্ঠিত ইসলামী খিলাফতের শাসনামলে ইসলামের বিচার ব্যবস্থা যা শাসক গোষ্ঠীর হস্তক্ষেপ মুক্ত, স্বাধীন, অবাধ ও নিরপেক্ষ হিসেবে খ্যাতি লাভ করে, তা ছিল মূলত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মানবতাবোধ ও মানবাধিকারের উদার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে উৎসারিত। মনীষী বার্ক এ সম্পর্কে চমৎকারভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কৃতিত্বের স্বীকৃতি দিয়েছেন।

---

36 . আল্-হাদীস, তিরমিযী শরীফ থেকে উদ্ধৃত : মুহাম্মদ ফায়জুল হক, যুদ্ধ বন্দিদের সঙ্গে আচরণ : কোরআন কী বলে, দৈনিক যুগান্তর, ১৪ মে ২০০৪ সংখ্যা, পৃ. ১২।

37 . উদ্ধৃতি, মুহাম্মদ ফায়জুল হক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২।

38 . আল্-কুরআন, সূরা আন-নিসা : ১৩৫।

সামাজিক ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
উল্লেখিত ক্ষেত্রগুলোর পাশাপাশি বৃহত্তর সমাজ ও মানবিকতার ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে অনুপম আদর্শ রেখে গেছেন তা মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও সর্বজনীন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। এমন কতকগুলো ক্ষেত্র এখানে আলোচনার দাবী রাখে:

শান্তি, সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠায়

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক স্পষ্ট ভাষায় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন যে, "আমি তোমাকে সমগ্র সৃষ্টির জন্যে রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।"[39] কুরআনের এ বাণী পরিপূর্ণভাবে সত্যে পরিণত করেছিলেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। সমাজ, রাষ্ট্র ও সমগ্র মানব জাতির ভ্রাতৃত্ব, শান্তি, সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠায় তিনি যে অনন্য সাধারণ উদাহরণ রেখে গেছেন পৃথিবীর ইতিহাসে তা আজো অদ্বিতীয় এবং সর্বজন স্বীকৃত অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে স্বীকৃত। কেননা তিনি কেবল মুসলিমদের আদর্শ ছিলেন না, ছিলেন গোটা মানব জাতির আদর্শ। আল্লাহ পাক তাঁকে এই মর্মে ঘোষণা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন: "বলুন (হে মুহাম্মাদ), হে মানবজাতি, আমি তোমাদের সবার জন্য আল্লাহর রসূল।"[40]
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন সেই ব্যক্তিত্ব যিনি অতি শৈশবে বিস্ময়করভাবে সমবণ্টন নীতিতে তার দুধমাতা হালিমার ঘরে দুধমাতার একটি মাত্র স্তন পান করতেন আর একটি রেখে দিতেন হালিমার নিজের সন্তানের জন্যে।"[41] তাঁর জীবনে সবক্ষেত্রে সব পর্যায় শান্তি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় তিনি অনুকরণীয় আদর্শ রেখে গেছেন, এমনকি নবুওয়তের আগেও, "হিলফুল ফুজুল" গঠন তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আল্লাহ পাকের দেয়া বাণী প্রচার ও তাঁর একত্ববাদী ধর্মমত প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কি মক্কায়, কি তায়েফে বহুভাবে তিনি নির্যাতিত ও নিগৃহীত হয়েছেন- কিন্তু কিছুতেই ধৈর্যহারা হননি। পরবর্তীকালে শত্রুর মোকাবেলা করতে, নওমুসলিমদের জীবন ও নতুন রাষ্ট্রকে বাঁচাতে আল্লাহ পাকের অনুমতিক্রমে তাঁকে হয়তঃ অনেকগুলো যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছে কিন্তু, গবেষকগণ যথার্থই বলেছেন, "সবগুলো যুদ্ধই ছিল

39 . আল্-কুরআন, সূরা আম্বিয়া : ১০৭।

40 . আল্-কুরআন, সূরা আরাফ : ১৫৮।

41 . অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম, শান্তির দূত হযরত মুহাম্মাদ (সা.), সীরাত স্মরণিকা ১৪১৫, ইফাবা, ঢাকা, পৃ. ৩৮।

প্রতিরক্ষামূলক এবং শান্তিকে সুদৃঢ় বুনিয়াদের উপর সংস্থাপনের লক্ষ্যে।"[42] মনে রাখতে হবে, তিনি যুদ্ধ করেছিলেন সম্পূর্ণভাবে পবিত্র কুরআনের এই নীতিমালার অধীনে: "তাদেরকে যুদ্ধ (কিতাল)-এর অনুমতি দেয়া হলো যারা আক্রান্ত হয়েছে, কেননা তাদের উপর যুলম করা হয়েছে"[43] এবং "যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর রাহে যুদ্ধ কর কিন্তু সীমালংঘন করো না। আল্লাহ সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"[44]

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাই যুদ্ধ করেছেন শান্তির জন্যই। যখনই শান্তি চুক্তির প্রস্তাব এসেছে এমনকি আপাত দৃষ্টিতে তা মুসলিম স্বার্থ বিরোধী হলেও, তিনি বিনা দ্বিধায় তা গ্রহণ করেছেন একমাত্র শান্তির প্রত্যাশায়। হুদায়বিয়ার সন্ধি তার জ্বলন্ত প্রমাণ। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিযানটি ছিল একটি রক্তপাতহীন অনন্য সাধারণ যুদ্ধ। সমগ্র মক্কাবাসী যখন তাদের দ্বারা নির্যাতিত, বিতাড়িত, চরম প্রতিহিংসার শিকার মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাতে চরম দণ্ড পাওয়ার আশংকায় ক্ষণ ইতিহাস রচনা করেন।

বংশমর্যাদা আর জ্যাত্যাভিমানের সেই যুগে তিনিই প্রথম শান্তি আর সাম্য প্রতিষ্ঠায় এই মহান বাণী প্রচার করেন যে, "তাকওয়া (খোদা ভীরুতা) ছাড়া অন্য কোন কারণে অনারবদের উপর আরবদের কোন মর্যাদা নাই। সাদা কালোর প্রতি এবং কালো সাদার প্রতি বৈষম্য ছোট বা বড় নয়। তাই তো তিনি হাবসি গোলাম বেলাল (রা.)-কে পৃথিবীর প্রথম মুয়াজ্জিন-এর মর্যাদা দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। উপঢৌকন পাওয়া ক্রীতদাস যায়দ বন হারিসকে কেবল আজাদই করেছিলেন তা নয়, নিজের ফুপাতো বোন জয়নাবের সাথে তার বিয়ে দিয়ে পরিবারের একজন করে নিয়েছেন। নাগরিক অধিকারের প্রশ্নে অমুসলিমদেরকেও তিনি সমান অধিকার দিয়েছেন। তার স্পষ্ট নির্দেশ: "ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিমদের রক্ত আমাদের রক্তের মতই পবিত্র। তাদের ধন-সম্পদ আমাদের ধন-সম্পদের মতই হিফাজতযোগ্য।" নাগরিক সাম্য ও মৈত্রীর এই মহান নীতি ইসলাম ও মুসলিম শক্তি ভিন্নধর্মী কোন নাগরিকের ওপরেই জবরদস্তিমূলকভাবে ইসলাম চাপিয়ে দেননি, যার ছোট একটা উদাহরণ এই যে, প্রায় এক হাজার বছর মুসলিমরা এ উপমহাদেশে শাসকালেও মুসলিম জনসংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার মাত্র এক চতুর্থাংশ।"[45]

---

42 . প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

43 . আল্-কুরআন, সূরা হজ্জ : ৩৯।

44 . আল্-কুরআন, সূরা বাকারা : ১৯০।

45 . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

দয়া, ক্ষমা ও শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায়

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু, ক্ষমাশীল ও কোমল। দয়া, ক্ষমা, শান্তি ও সাম্যের প্রতিরূপ এই মহামানব স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, "যে মানুষকে দয়া করে না, আল্লাহ পাক তাকেএ দয়া করেন না।"[46] এখানে কেবল মুসলিমদের কথাই নয় বরং গোটা মানব জাতির কথা বলা হয়েছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি দয়া ও ক্ষমা প্রদর্শনকে তিনি নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন। অন্য একটি হাদীসে হাদীসে মহানবী (সা.) বলেন: "পৃথিবীতে যারা আছে তাদের প্রতি দয়া কর। উর্দ্ধালোকে যারা আছেন আর তারা তোমার প্রতি সদয় হবেন।"[47] অন্যদিকে শ্রমিক অধীনস্থ কর্মচারী চাকর-চাকরানীদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা, তাদেরকে নিজেদের অনুরূপ খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-আশাক, বিশ্রাম ইত্যাদির ব্যবস্থা করতেও তিনি বারংবার তাগিদ দিয়েছেন। বস্তুত বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শ্রমিকদের সব প্রকার বঞ্চনা, অত্যাচার, নিপীড়ন আর গ্লানির অবসান করে এমন সব শ্রমনীতির প্রবর্তন করে গেছেন যার সিকি শতাংশও জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (আই.এল.ও) বিগত ১১৮ বছর ধরে মে দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমেও প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।"[48]

বুখারী ও মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত এক হাদীসে বলা হচ্ছে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন: শক্তি-সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাজ শ্রমিকদের উপর চাপাবে না। যদি তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত কেন কাজ তাকে দাও তাহলে সে কাজ শ্রমিকদের উপর চাপাবে না। যদি তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত কোন কাজ তাকে দাও তাহলে সে কাজে তাকে সাহায্য কর।[49] তিনি আরো বলেছেন: "বিনিয়োগকারী যেন নিয়োজিত শ্রমিকের কাছ থেকে তার সামর্থ্যের বাইরে কোন কাজ আশা না করে। শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নষ্ট হতে পারে এমন কোন কাজে যেন তাদের বাধ্য করা না হয়।"[50] শ্রমিকের প্রাপ্য মজুরী থেকে তাকে বঞ্চিত করা সেই আবহমান কাল থেকেই মালিক পক্ষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আজকের সমাজে এর উদাহরণ ভুরি ভুরি পাওয়া যায়। অথচ এ ব্যাপারে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কঠোর নির্দেশ রয়েছে তাদের ন্যায্য মজুরী প্রদানের জন্যে। বায়হাকী শরীফের একটি হাদীস অনুযায়ী, রাসূল

---

46 . আল্-হাদীস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

47 . আল্-হাদীস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

48 . মুহাম্মাদ ফরহাদ হোসেন, মে দিবস, শ্রমিক শ্রেণী এবং ইসলাম, দৈনিক যুগান্তর, ৩০ এপ্রিল ২০০৪, পৃ. ১২।

49 . প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

50 . আল্-হাদীস, ইবনে মাজাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ।

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "কিয়ামতের দিন তিন প্রকার মানুষের সঙ্গে আমি ঝগড়া করবো, আর যার সঙ্গে ঝগড়া করবো তাকে আমি পরাজিত করে ছাড়বো। তার মধ্যে এক ব্যক্তি হলো, শ্রমিক থেকে সে পুরোপুরি কাজ আদায় করে কিন্তু সে অনুপাতে পারিশ্রমিক প্রদান করে না।"[51] তিনি আরো বলেন: "শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগে তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।"[52] অন্যদিকে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শ্রমিকদের মালিকের সঙ্গে অযথা বাড়াবাড়ি করাকে নিষিদ্ধ করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে শ্রমিকের কাছে মালিকের জিনিসপত্র আমানতস্বরূপ। এসব নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি এক অপূর্ব আদর্শ স্থাপন করে গেছেন।

শুধু তাই নয়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নবী হওয়া সত্ত্বেও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে শ্রমিকের কাজ করেছেন। কখনো বাণিজ্য প্রতিনিধি হিসাবে, নিজ হাতে জুতা সেলাই করে, খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খনন কর, পরিখা খননে বাধাগ্রস্থ বড় বড় পাথরকে কুঠারের আঘাতে টুকরা করে, সঙ্গী সাথীদের জন্য রান্নার কাঠ সংগ্রহে নিজ হাতে কুঠার ধরে, শ্রমিককে ভাই সম্বোধন করে, শ্রম ও শ্রমিকের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি বলেছেন শ্রমকে তাচ্ছিল্য করো না কারণ শ্রম আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম। তিনি আরো বলেন, সকল নবী-রাসূলই মেষচারী ছিলেন।[53] বিদায় হজ্জের ভাষণে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি নির্দেশ দেন: "সতর্ক থাকিও, সতর্ক থাকিও দাস-দাসী সম্পর্কে। তোমরা যেরূপ খাবে তাহাদেরও অবশ্যই খাওয়ার ব্যবস্থা করিবে। তোমরা যেরূপ পরিবে তাহাদেরও পরার ব্যবস্থা করিবে।"[54] এভাবে শান্তি, মৈত্রী, ক্ষমা, দয়া শ্রমের মর্যাদা ও ন্যায় বিচারের যে মহান আদর্শ মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রেখে গেছেন নিজের জীবনে তার প্রতিষ্ঠা করে- মানব মর্যাদা ও মানবাধিকারের ধারণা ও তা অর্জনের ক্ষেত্রে তা এক অতুলনীয় দিক-নির্দেশনা। তাঁর এই গুণাবলী ও দৃষ্টিভঙ্গীতে মুগ্ধ বিখ্যাত দার্শনিক, সাহিত্যিক জর্জ বার্ণাড শ' তাই বলতে কুণ্ঠাবোধ করেননি, "If all the world was united under one leader, Mohammad would have been the best fitted man to lead the peoples of various creeds, dogmas and ideas to peace and happiness."[55]

---

51 . প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

52 . বায়হাকী শরীফের হাদীস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

53 . মুজাহিদ হুসাইন ইয়াসীন, শ্রমিক আল্লাহর বন্ধু, দৈনিক যুগান্তর, ৩০ এপ্রিল, ২০০৪, পৃ. ১২।

54 . রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিদায় হজ্জে ভাষণ, বাংলায় বোখারী শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭।

55 . অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

নারী অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায়

নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার বিষয়টি বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়গুলোর একটি। নারী মুক্তির প্রবক্তা হিসাবে আমরা হয়ত কেট মিলে (Kate Millet), জার্মেন গ্রীয়ার (Germaine Greer) বা অ্যানী নূরাকীন (Anne Nurakin) প্রমুখের নাম জানি; শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি মেরী উলস্টন, অ্যানী বেসান্ত, মার্গারেট সাঙ্গাঁর, সুলতানা রাজিয়া, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রমুখ মহীয়সী মহিলাদের সংগ্রামের ইতিহাস। কিন্তু মানব সভ্যতার ইতিহাসে নারীর অধিকার ও মর্যাদার জন্য যে ব্যক্তি প্রথম সোচ্চার হয়ে ওঠেন, নারীকে সংসার ও সমাজের অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য অংশ হিসাবে যে ব্যক্তি প্রথম স্বীকৃতি দেন, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নারীর অধিকার পরিপূর্ণ আকারে যে ব্যক্তি প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন, সত্যিকার অর্থে নারী জাগরণ ও নারী মুক্তির ইযিন প্রবক্তা তিনি হচ্ছেন 'একজন পুরুষ' এবং তিনি আর কেউ নন- মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। একথা আদৌ অত্যুক্তি হবে না যে, জীবনে অন্য কিছু না করলেও শুধুমাত্র নারী জাগরণের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানই বিশ্ব মনীষায় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সুউচ্চ আসনে সুদৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত করবে।"[56]

নারীর প্রতি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দর্শন এসেছে মূলতঃ কুরআনের নীতি-দর্শন থেকে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর জন্মকালে নারীকে বিশ্বের কোথাও এমনকি স্বাধীন মর্যাদাবান মানুষ হিসাবেও বিবেচনা করা হতো না। নারীকে 'ভোগের বস্তু', 'লাঞ্ছনা' ও 'পাপের প্রতিমূর্তি' এবং কোথাও কোথাও অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির মত 'সম্পত্তি' বলে মনে করা হতো। পবিত্র কুরআনে সূরা আন্-নাহল এ আল্লাহ পাক নিজেই তৎকালীন সমাজে নারী সম্পর্কে মানুষের মানসিকতাকে চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। "যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয় তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায়, সে অসহনীয় মনসতাপে ক্লিষ্ট হয়। তাকে যে সংবাদ দেয়া হার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে হানীতা সত্ত্বেও সে তা রেখে দাবে না মাটিতে পুঁতে দেবে" (আয়াত ৫৮-৫৯)। এভাবে শুধু সাধারণ মানুষই নয়, বড় বড় মনীষীরাও চিন্তা করতেন এবং বহুদিন এই দ্বন্দের সম্মুখীন ছিলেন যে, নারী প্রকৃতই মানুষ কিনা, খোদা তাদের মধ্যে আত্মা দিয়েছেন কিনা ইত্যাদি। এরূপ অবস্থায় শুধু আইনের দিক দিয়ে নয়, বরং মানবিক দিক দিয়েও ব্যতিক্রমী বিপ্লব আনয়ন করেছেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইসলাম। আজকাল নারী মুক্তি, নারী স্বাধীনতার যে স্লোগান শোনা যায়, তা ঐ বৈপ্লবিক বাণীরই প্রতিধ্বনি যা

---

56 . সৈয়দ আশরাফ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

মুহাম্মাদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মুখে চৌদ্দশ বছর পূর্বে উচ্চারিত হয়েছিল।"[57]

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রথম পদক্ষেপ ছিল কন্যা শিশু হত্যা বন্ধ করা। তিনি বরং কন্যা শিশুর লালন-পালনকে নানাভাবেব উৎসাহিত করেছেন এবং নিজেও তাঁর কন্যাদের লালন-পালন কালে সেটা করে দেখিয়েছেন। পিতাদের তিনি স্পষ্ট বলে দিয়েছেন: "কন্যা তার জন্য লজ্জাস্কর নয় বরং কন্যা সন্তান প্রতিপালন তার জন্য জাহান্নামের পথে বাধা এবং জান্নাত লাভের উসিলা হতে পারে।" তিনি আরো বলেন, "যদি কারো কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং সে তাদেরকে সন্তুষ্ট চিত্তে লালন-পালন করে তাহলে তার জন্যে দোযখের প্রতিবন্ধক-ঢাল হবে।"[58] আবু দাউদ শরীফের অন্য একটি হাদীস অনুযায়ী রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "যার কন্যা সন্তান আছে সে যদি তাকে জীবন্ত কবর না দেয়, তাকে লাঞ্ছিত না করে এবং তার তুলনায় পুত্র সন্তানদের অধিক গুরুত্ব না দেয়, তবে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"[59] তাঁর এসব সুমহান বাণী সেকালে সন্তান সম্পর্কে মুসলিম অমুসলিম সকল মানুষের মনোভাবে আমুল পরিবর্তন আনে।

ঈমান, আমল বা ধর্মীয় সাধনায় উৎকর্ষতার ব্যাপারেও তিনি নারীকে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়ার সমান সুযোগ দিয়েছেন। কারণ আল্লাহ পাক তার কুরআনে ঘোষণা করেছেন, "যে কেউ উৎকৃষ্ট আমল করবে, সে নারী হোক অথবা পুরুষ হোক, যদি সে ঈমানদার হয়, তাহলে এ ধরনের লোক বেহেশতে প্রবশ করবে এবং তাদের প্রতি তিল পরিমাণ অন্যায় করা হবে না।"[60] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঘোষণা করেন, "পুরুষদের জন্যে পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় নেয়ামত হচ্ছে 'উত্তম স্ত্রী'।" অন্যদিকে নারীকে তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পরে সবচেয়ে বেশি মর্যাদার অধিকারী করে বলেছেন, "আল্লাহ ও রাসূলের পরে সবচেয়ে বেশি সম্মান, মর্যাদা ও সদ্ব্যবহার পাবার যোগ্য 'মা'।" তিনি এও বলেছেন, "মা'র অবাধ্যতা এবং অধিকার হরণ আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য হারাম করে দিয়েছেন।" তিনি ঘোষণা করেন, "মায়ের পদতলেই সন্তানের বেহেশত।"[61] সন্তানের কাছে মায়ের এতবড় সম্মান, এত বড় মর্যাদা

---

57. হাফেজা আসমা খাতুন, নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.), সীরাত স্মরণিকা ১৪১৫ হিজরী, ইফাবা, ঢাকা, পৃ. ৫১।
58. নাসায়ী শরীফ, উদ্ধৃত, হাফেজা আসমা খাতুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।
59. গাজী শাসুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫।
60. আল্-কুরআন, সূরা নিসা : ১২৪।
61. বুখারী, মুসলিম ও নাসায়ী শরীফের হাদীস, উদ্ধৃত, হাফেজা আসমা খাতুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

মানবোতাহাসে তাঁর মত করে আর কোন মহাপুরুষ বা রাষ্ট্রনায়ক প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন নি।

নারী মুক্তির দিশারী মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নারীকে শুধু বাঁচিয়ে রেখে সম্না ও মর্যাদা দিয়েই ক্ষান্ত হননি, তিনি নারীকে যথাযথ অধিকার দিয়ে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। নারীকে তিনি অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষাগত, আইনগত এবং ধর্মীয় সব দিক দিয়ে তার অধিকার নিশ্চিত করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর বৈপ্লবিক সিদ্ধান্তসমূহকে সংক্ষেপে এভাবে উল্লেখ করা যায়:

ক. নারীকে পিতার সম্পত্তিতে, স্বামী, সন্তান ও মায়ের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী ধার্য করা হয়েছে

খ. বিয়ের সময় নারীকে মোহরানা বা দেনমোহর প্রাপ্তি আবশ্যিক করেছেন এবং তা আদায় না করার বা তা থেকে জোর করে ব্যয় করার অধিকার স্বামী, পিতা বা ভাই কাউকে দেয়া হয়নি;

গ. নারীকে স্বামী নির্বাচনের পূর্ণ অধিকার দেয়া হয়েছে এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে কোথাও বিয়ে দেয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অন্যদিকে একজন অকর্মন্য, অত্যাচারী স্বামী থেকে বিবাহ বিচ্ছেদের পূর্ণ অধিকার নারীকে দেয়া হয়েছে। একই সাথে বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা নারীকে ২য় বিবাহের বা পুনঃর্বিবাহের পূর্ণ অধিকার দেয়া হয়েছে;

ঘ. দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি তিনি;

ঙ. বিদ্যাশিক্ষা করা বা জ্ঞানার্জন করার ব্যাপারে নারীকে পুরুষের মতই সমান অধিকার দেয়া হয়েছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর জন্য ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য";

চ. অত্যাচার, অপমান, অশালীনতা ও অবমাননা থেকে নারীকে রক্ষার জন্যে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহিলাদের পোশাক পরিধানে ও জনসমক্ষে চলাফেরার সময় একটি অনুসরণীয় পোষাক-বিধি (Dress code) মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তিনি যেসব বিধি বিধান দিয়েছেন আপাত দৃষ্টিতে তা কারো কারো কাছে নারীর অধঃস্তনতা মনে হলেও নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সেটা যে কতখানি সাফল্য আনতে পারে বিগত বহু শতাব্দী ধরে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে, আর তার ইপরীতে বর্তমানে ভোগবাদী বিশ্বের নারী-মুক্তির নামে যা কিছু চলছে তাতে প্রকৃত অর্থে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি না পেয়ে নারী বরং ভোগ্য পণ্য ও লালসার সামগ্রীতে পরিণত হচ্ছে ক্রমশ।

পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের মধ্যে শান্তি ও অধিকার প্রতিষ্ঠায়

অন্যান্য অনেক ধর্মগুরু, ধর্মপ্রচারক বা মহাপুরুষের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন কিভাবে কেটেছে তা জানা যায় না। কিন্তু সম্ভবত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম)-এর পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বেশি আলোচনা পর্যালোচনা হয়েছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পারিবারিক জীবনকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি'র পথ তিনি পরিহার করে চলেছেন। বরং তার মতে পরিবার ও সমাজে শান্তি, সাম্য, ন্যায়বিচার ও আল্লাহ পাকের আনুগত্য করাই প্রকৃত ধর্মাচরণ। আমরা ইতোপূর্বে 'বিবাহ' ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিবারের ভিত্তি রচনা, উত্র সন্তানের পাশাপাশি কন্যা সন্তানকে স্বাগত জানানো এবঙ কন্যাকে অধিক গুরুত্বদান, স্ত্রীর অধিকার প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর জীবন-দর্শন আলোচনা করেছি- যেখানে দেখা গেছে মানুষের জীবনের একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে অধিকার ও মানবতা প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান রয়েছে। এখানে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে মানুষের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান সম্পর্কে অন্য কয়েকটি বিশেষ দিকের উপর আলোকপাত করা হলো:

মানবাধিকারের এই উচ্চকণ্ঠের যুগে পরিবার-ব্যবস্থা ক্রমশ যেখানে দূর্বল হয়ে পড়ছে, নগরায়ন ও শহরায়নের পাশাপাশি লাগামহীন ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য বিশেষত শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও অন্যান্যদের প্রতি ক্রমশ নিরাপত্তহীনতা, অধিকার না পাওয়ার ও লাঞ্চনার আশংকা বাড়ছে। অথচ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দৃঢ়ভাবে পারিবারিক দায়িত্ব পালনে তাগিত দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে পিতা-মাতার সাথে সন্তানের সম্পর্ক ও দায়িত্বের কথা স্পষ্ট ঘোষণা করে বলা হয়েছে: "তোমরা কখনো তাদের প্রতি বিরক্তিসূচক হুঁ অথবা উঃ শব্দটি উচ্চারণ করবে না। প্রত্যক্ষ পরোক্ষ উভয়ভাবেই মাতার সম্মান করবে। ভাষায় নম্র এবং অন্তরেও বিনয়ী হবে।"[62]
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে মা-বাবার সম্মান-মর্যাদা ও পরিবারে তাদের অধিকার রক্ষার বিষয়টি কুরআনের নির্দেশনার আলোকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি বলেছেন, "তোমাদের মাতা তোমাদের চেয়ে শ্রদ্ধার পাত্রী" (বুখারী, কিতাবুল আদাব)। বলতেন, "মাতা পিতার সন্তুষ্টি ব্যতীত বেহেশতের দ্বার উন্মুক্ত হবে না" (তিরমিযী, কিতাবুল বিরর ওয়াসসিলা)।[63] নিজের পরিবারে যিনি সততা, ন্যায়পরায়ণতা, দায়িত্ববোধ ও সকল সদস্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না তিনি যতই জগৎ জয় করুন, শ্রেষ্ঠ মানুষ হতে পারবেন না- এটিই মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবন দর্শন। অন্যদিকে তাঁর মতে, পরিবারে স্ত্রীর মর্যাদাও অনেক উঁচুতে। তিনি বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে তারাই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ব্যক্তি যারা

---

62 . আল্-কুরআন, সূরা বনী ইসরাইল : ৩।

63 . মাওলানা মুহাম্মদ যখীরুদ্দিন পূরানুভীহাভী, ইসলামের যৌন বিধান (মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান রহমতী অনূদিত), ইফাবা, ১৯৮৭, পৃ. ২৭।

তাদের স্ত্রীদের কাছে উৎকৃষ্ট এবং আপন পরিবার-পরিজনদের সাথে স্নেহশীল ব্যবহার করে"।[64] মনে রাখতে হবে তাঁর যুগে এই কথা বলা ও পরিবারে তার অনুশীলন করা ছিল অত্যন্ত কঠিন এবং যুগান্তকারী এক পদক্ষেপ।

কেবল নিজের পিতা-মাতা নয়, অন্যের পিত-মাতাকে শ্রদ্ধা ও সম্মানের কথাও গুরুত্বের সাথে বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "কবিরা গুনাহ্গুলোর মধ্যে সবচাইতে বড় গুনাহ্ হলো কোন লোকের পিতা-মাতার উপর লানত করা। কিজ্ঞাসা করা হলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কিভাবে কেউ নিজ পিতা-মাতার উপর লানত করতে পারে? তিনি বললেন, একজন অপরজনের পিতা-মাতাকে গালি দেয়। তখন সেও ঐ ব্যক্তির পিতা-মাতাকে গালি দেয় (নিজ পিতা-মাতার গালির কারণ হয়)।[65] পিতা মাতার সেবা যত্ন সম্পর্কে তাঁর আরেকটি হাদীস প্রণিধানযোগ্য: "যে সন্তান তার পিতা-মাতার দু'জনের একজনকেও বার্ধক্যে পেলো, অথচা জান্নাতে যেতে পারলো না, তার মতো দূর্ভাগা আর নাই।"[66] পারিবারিক জীবনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেমন ব্যবহার করতেন সে সম্পর্কে চমৎকারভাবে বলেছেন তাঁরই স্ত্রী আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)। তাঁর ভাষায়, "রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাউকে তিরস্কার করতেন না। দূর্ব্যবহারের দ্বারা তিনি দূর্ব্যবহারের জবাব দিতেন না, বরং ক্ষমা প্রদর্শন করতেন। ... ব্যক্তিগত কারণে তিনি কারো উপর কোনদিন প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। কোন দাস-দাসী, স্ত্রী বা চাকর-চাকরানী এমনকি কোন পশুকেও তিনি কোনদিন আঘাত করেন নি। কারো কোন সংগত আবেদন বা অনুরোধ তিনি কখনো প্রত্যাখ্যান করেন নি।"[67]

পারিবারিক জীবনে তিনি নিজে স্ত্রীদের সাথে আমোদ-প্রমোদ এমনকি ঘরোয়া দৌড় প্রতিযোগিতা (খেলাচ্ছলে) পর্যন্ত করেছেন। তিনি নিজ হাতে নিজের টুপি বা জামা সেলাই করতেন, পরিবারের অন্যদের উপর কাজ চাপিয়ে দিতেন না। "নিজ হাতে বকরীর দুধ দহন করতেন। তরি-তরকারী কেটে দিতেন এবং ঘরের বিভিন্ন কাজে স্ত্রীগণকে সাহায্য করতেন।"[68] ... অর্থাৎ রাষ্ট্রনায়ক ও নেতা হিসাবে জগদ্বিখ্যাত হওয়ার

---

64 . হাফেজা আসমা খাতুন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২।

65 . বোখারী, হাদীস নং ২৫০১, বাংলায় বোখারী শরীফ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯৬।

66 . আল্-হাদীস, বোখারী ও মুসলিম থেকে উদ্ধৃত, হাফেজা আসমা খাতুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

67 . গাজী আবু হুরায়রা, ঘনিষ্ঠ সাথীদের দৃষ্টিতে মহানবী (সা.), সীরাত স্মরণিকা ১৪১৫ হিজরী, ইফাবা, ঢাকা, পৃ. ৭৩।

68 . মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.), কুরআন হাদীসের আলোকে পারিবারিক জীবন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

পরও, বিশ্ব মানবতার এই মুক্তিদূত পারিবারিক জীবনকে মোটেই অবহেলা করেন নি বরং সেখানে প্রতিষ্ঠা করেছেন শান্তি, মানবতা ও অধিকারের উত্তম আদর্শ।

অন্যদিকে সামাজিক জীবনে আত্মীয়-পরিজন প্রতিবেশী সকলের সাথে সদ্ব্যবহার, সৌহার্দপূর্ণ আচরণ, মমতার বন্ধন ও সহনশীলতা রচনা করার জোর তাগিদ দিয়েছেন তিনি। আত্মীয় সম্পর্কের উপর তিনি কতখানি জোর দিয়েছেন তা নিম্নোক্ত ৩টি হাদীসের আলোকে বোঝা যাবে।[69]

ক. "আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না।"

খ. "যে ব্যক্তি হায়াত ও রিজিক বৃদ্ধি পছন্দ করে সে যেন আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করে।" ও

গ. "রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়তা ডালস্বরূপ। যে ব্যক্তি এর সাথে সম্পর্ক জুড়ে রাখে, আমি তার সাথে সম্পর্ক জুড়ে রাখি। আর যে ব্যক্তি এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি।"

বৃহত্তর সমাজ-জীবনে শান্তি, সাম্য ও অধিকার প্রতিষ্ঠায়

মুহাম্মাদ (সা.) নিজ পরিবার, আত্মীয়-স্বজনের পর দৃঢ়ভাবে প্রতিবেশীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। মেহমানদের অধিকারও তিনি নির্ধারিত করেছেন। তাঁর মতে "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষদিনে ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই মেহমানের সম্মান করে, প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয় এবং অবশ্যই ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে।"[70] মানুষ আজকের দিনেও তার অন্যান্য প্রতিবেশীদের অনিষ্ট থেকে মুক্ত নয়- তা সে সমাজ জীবনে হোক বা রাষ্ট্রীয় জীবনে হোক। অথচ নবী করীম (সা.) বার বার প্রতিবেশীর- তা সে যে ধর্ম, বর্ণ, যে গোত্রেরই হোক না কেন- সন্তুষ্টি ও তার সাথে ন্যায় বিচারের কথা বলেছেন। অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তিনি ঘোষণা করেন: "আল্লাহ্‌র কসম! সে লোক মুমিন নয়, আল্লাহ্‌র কসম! সে লোক মুমিন নয়, আল্লাহ্‌র কসম! সে লোক মুমিন নয় ... যে লোকের অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী (তা সে যে-ই হোক) নিরাপদ নয়।"[71] সামাজিক শান্তির এর চেয়ে বড় দলীল আর কি হতে পারে।

বৃহত্তর সমাজ জীবনেও তিনি শান্তি, সাম্য, ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ, পরস্পরের প্রতি অধিকার ও দায়িত্ববোধে উজ্জীবিত করেছেন বিশ্ববাসীকে। তাঁর সমাজ দর্শন এমনই যে, "মানুষ সহজ সরল বিনয়ী জীবন যাপন করবে। আচার-আচরণ, চলাফেরা ও কথাবার্তায় সে এমনভাবে থাকবে, যেন অপরের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ না পায়।

---

69 . বুখারী, হাদীস নং ২৫০৩, ২৫০৫ ও ২৫০৮, বাংলায় বুখারী শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৬-৯৭।

70 . প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৫২৩, পৃ. ৬৯৯।

71 . প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৫২১, পৃ. ৬৯৯।

মজলিসে বসলে এমনভাবে বসবে যেন নিজেকে মজলিসের প্রধান মনে না হয়।"[72] সমাজকে তিনি দেখেছেন মানব দেহের মত করে। তিনি বলেছেন: "দয়া প্রদর্শনে, প্রেম-ভালবাসায়, মায়া-মমতায় এবং একের সাহায্যে অন্যের ছুটে আসাকে ঈমানদারগণ তার দেহের সমতুল্য করে দেখবে। দেহের কোন অঙ্গ ব্যাথা হলে গোটা দেহটাই অনিদ্রা ও জ্বরে তার শরীক হয়ে যায়।"[73] সমাজে ভিন্ন পথ, ভিন্ন মতাবলম্বী মানুষ থাকতেই পারে কিন্তু তাই বলে তাদের মধ্যে বিবাদ, দ্বন্দ, অশান্তি ও হিংসা-বিদ্বেষকে কোনভাবেই অনুমোদন দেননি তিনি। তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ "তোমরা সহজ পন্ধা অবলম্বন কর, কঠিন পন্থা অবলম্বন করো না। মানুষকে শান্তি ও স্বস্তি দাও, মানুষের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়াইও না।" অন্য একটি হাদীসে তিনি বলেছেন: "তোমরা পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষভাব রেখো না, হিংসা করো না, বিচ্ছেদাত্মক আচরণ করো না। বরং সবাই এক আল্লাহ্র বান্দা হয়ে ভাই বনে যাও ...।"[74] অমুসলিম বা ধর্মে-কর্মে নিয়মিত নন এমন কোন মানুষকে গালি দেয়া তিনি নিষেধ করেছেন: "কেউ যেন অন্য ব্যক্তিকে ফাসেক ও কাফের বলে অভিহিত না করে। কেননা, যাকে বলা হয়েছে সে তা না হলে যে বলেছে তা তার উপর ফিরে আসবে।"[75]

মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সমাজে এতীম, বিধবা অসহায়দের অধিকার রক্ষার ও তাদের কল্যাণে নিজে যেমন সারা জীবন কাজ করে গেছেন অন্যকেও তেমনি দায়িত্ব পালনের তাগিত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: "ক্ষুধার্তকে খাবার দিও, পীড়িত ও রুগ্নকে দেখতে যেও এবং মুসলিম হোক কি অমুসলিম হোক, সকল নির্যাতিত মানুষকে সাহায্য করো।"[76] এতীমের তত্ত্বাবধানকে উৎসাহিত করতে তিনি বলেছেন (শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুলের মধ্যকার দূরত্ব দেখিয়ে) : "আমি এবং এতীমের তত্ত্বাবধানকারী বেহেশতে এভাবে (কাছাকাছি) থাকবো।"[77] তিনি আরো বলেছেন: "বিধবা এবং গরীব-মিসকীনদের সাহায্য-সহায়তার চেষ্টা সাধনকারী, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী অথবা দিনভর রোযা ও রাতভর নামায আদায়কারীর অনুরূপ।"[78] একাধিক বর্ণনাকারী থেকে প্রাপ্ত এই হাদীসটিতে দেখা যায়, অপরিহার্য এবাদত এর সাথে গরীব-মিসকীন ও বিধবাদের সাহায্য ও সেবাদান করাকে সমতুল্য ঘোষণা করে তাদের অধিকার আদায়ের

---

72 . মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২।

73 . বোখারী শরীফ, হাদীস নং ২৫৭১, বাংলায় বোখারী শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৯, ৬৯৯।

74 . প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৫৪৩ ও ২৫৩৪, পৃ. ৭০৩ ও ৭০২।

75 . প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৫২৯, পৃ. ৭০১।

76 . মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

77 . প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৫১৪, পৃ. ৬৯৮।

78 . প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৫১৫, পৃ. ৬৯৮।

পথ সুপ্রশস্ত করেছেন এই মানবতাবাদী মহাপুরুষ। এতীম, অসহায়দের সম্পদ হরণ করাকে তিনি কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন: "এতীমদের সম্পদ আত্মসাৎ করা মানুষের ইহকাল ও পরকাল ধ্বংসকারী পাপের মধ্যে গণ্য হবে।"[79] রাগ বা ক্রোধ যা প্রায়শই আমাদের সমাজ জীবনে অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তাকে তিনি সর্বান্তকরণে দমন করতে বলেছেন। তিনি বলেন: "যে কুস্তিতে (অন্যকে) হারিয়ে দেয় সে প্রকৃত বীরপুরুষ য়, বরং সে-ই প্রকৃত বীর পুরুষ যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।"[80] এভাবে পরনিন্দা, পরচর্চা, কুৎসা রচনা, চুরি এমনকি অযথা সন্দেহ করাকেও নিষিদ্ধ করেছেন তিনি।

এমনিভাবে সমাজে শান্তির জন্যে যা যা প্রয়োজন, যাতে মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, অধিকার অর্জন সম্ভব হয় এমন সব কাজই তিনি করেছেন বা এমন সব বিষয়েই স্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। সেটি কেবল কোন ধর্ম, জাতি, দেশ বা কালের জন্য নয়- সর্বকালে, সব সমাজের সকল মানুষের জন্যে সমভাবে কল্যাণকর, শান্তি, সাম্য ও মানবাধিকারের নিয়ামক। পৃথিবীর যে কোন নিরপেক্ষ গবেষকের গবেষণায় এ সত্য উদ্‌ঘাটিত হবে এবং হয়েছে। শুধু তত্ত্বগতভাবে নয়, ছোট ছোট উদাহরণের মাধ্যমে তাঁর এসব নির্দেশনা বাস্তবায়নের পন্থাও তিনি দেখিয়েছেন। নিরপেক্ষ বিচারে, পৃথিবীর ইতিহাসে সমাজ জীবনে শান্তি, সাম্য, মৈত্রী, ভালবাসা, ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার এতবড় সুস্পষ্ট নিদর্শন আর কেউ কোথাও রেখে যেতে পেরেছেন বলে আমার জানা নেই। বিচারপতি আবূ সাঈদ চৌধুরী মানবাধিকারের গোড়ার কথা বলতে গিয়ে নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন, "মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আবির্ভাবের পর সমাজ জীবনে নীতি ও নিষ্ঠার প্রবর্তন ঘটে এবং শান্তি ও সহমর্মিতাকে তিনিই মানব জীবনের আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন।" তিনি বলেন যে, "প্রত্যেক মানুষের বাঁচার অধিকার আছে, স্বস্তির অধিকার আছে এবং নির্বিঘ্ন জীবনের অধিকার আছে।"[81]

উপসংহার

উপসংহারে কয়েকটি বিশেষ দিক উল্লেখ একান্ত প্রয়োজন। প্রথমত, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন তা ছিল পবিত্র কুরআনের বর্ণিত আদেশ-নির্দেশ এর হুবহু অনুরূপ। পবিত্র কুরআন তার স্বাক্ষী দিচ্ছে: "মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজের ইচ্ছায় কিছুই বলেন না। তিনি তো তাই বলেন

---

79 . হাদীস দু'টি বুখারী ও মুসলিম শরীফ ও বাযফর থেকে নেয়া, মাওলানা মুহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬।

80 . আবু সাঈদ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

81 . প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২৫১৪, পৃ. ৬৯৮।

যা তাঁর নিকট আল্লাহর ওহীরূপে আসে।" অর্থাৎ তাঁর প্রত্যেকটা কথা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কথা, আর তাঁর প্রতিটি কাজ আল্লাহ্র বিধি-নিষেধের বাস্তবায়ন ব্যতীত আর কিছুই নয়।[82] সুতরাং নিজের ইচ্ছায় বা খেয়াল খুশিমত তিনি কিছুই করেন নি। তিনি যে জীবনদর্শন, মানবিক মর্যাদার রূপরেখা, মানবাধিকারের পরিধি ও সীমা নির্দিষ্ট করেছেন তা মহান আল্লাহ্ পাকেরই অনুমোদিত জীবন বিধান। একমাত্র স্রষ্টাই জানেন সৃষ্টির কিসে মঙ্গল কিসে অমঙ্গল। সমগ্র সৃষ্টি জগতের সবচেয়ে প্রিয় এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হচ্ছে 'মানুষ'। সেই প্রিয় সৃষ্টির পথচলার দিকনির্দেশনা হচ্ছে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেননা, আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) যেমন বলেছেন: রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন 'জীবন্ত কুরআন'। সুতরাং সেই জীবনদর্শন সার্বজনীন ও সার্বিক কল্যাণকর হবে তাতে আর সন্দেহ কি !

দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই জীবন বিধান- যা মানবাধিকারের প্রথম মৌলিক এবং পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনা হিসাবে স্বীকৃত তা কেবল কোন লিখিত দলীল নয়, কোন স্বাক্ষরিত চুক্তি নয়, কোন অনুকল্প (hypothesis) নয়, বরং তা হচ্ছে কঠোর বাস্তবতা। নিজের শৈশব থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ৬৩ বছরের প্রত্যক্ষ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেকে আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রত রেখে নিজের জীবদ্দশাতেই একটি ধ্বংসস্তুপ থেকে, একটি পুঁতিগন্ধময় অন্ধকার আস্তাকুড় থেকে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও মানবিক মূল্যবোধকে তুলে এনে এক সুষম লাগসই, অনুসরণযোগ্য, সার্বজনীন কল্যাণকর সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন। মানবাধিকার মানুষের মর্যাদা ও আল্লাহ্ পাকের আনুগত্যই ছিল যার ভিত্তি।

তৃতীয়ত, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই জীবন বিধান যা বর্তমান প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে তা পৃথিবীর সবচাইতে বেশি যাচাইযোগ্য, নির্ভুল বা বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থসমূহে সংকলিত, সবচেয়ে বেশি ভাষায় অনূদিত এবং সুরক্ষিত গ্রন্থপুঞ্জ বা তথ্যউৎস থেকে নেয়া- যার ভিত্তি হলো ১. আল্-কুরআন এবং ২. সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহ। সুতরাং এখানে উদ্ধৃত মৌলিক বিষয়গুলো ঐতিহাসিকভাবে এবং গবেষণা সাহিত্য পর্যালোচনার (literature review) দিক দিয়েও যে কোন ধরনের সংশয় ও সন্দেহের ঊর্ধ্বে।

মানবতার মুক্তিদূত নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনে এই অর্জন, এই স্পষ্ট সর্বজনগ্রাহ্য কল্যাণকর জীবন বিধান বিশ্বের অনেক গবেষক, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারা শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি পেয়েছে। "জর্জ বার্ণাড

82 . মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

শ' তার একাধিক লেখায় মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শি পৃথিবীতে সুখ ও শান্তি দিতে পারে বলে দৃঢ়তার সাথে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন: "I have prophesied about the faith of Muhammad that is would be acceptable tomorrow as it is beginning to be acceptable to the Europe of today."[83] মাইকেল হার্ট 'দ্য হানড্রেড : একশ জন ব্যক্তির শ্রেষ্ঠত্বের ক্রম-বিন্যাস করেছেন। তালিকার প্রথমেই (অর্থাৎ ১ নম্বরে) মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে নির্দ্বিধায় দাঁড় করিয়ে তিনি লিখেছেন: "My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels."[84]

সুতরাং তাঁর এই ভাবমূর্তি এমনকি অমুসলিম পণ্ডিত গবেষকদেরও নজরে এসেছে, যে ক'টি প্রধান কারণে- তাঁর উদার মানবতাবাদ, শান্তি ও সাম্যবাদ, মানবাধিকারের জন্য আদর্শ নীতি-দর্শন ও তাঁর বাস্তব প্রতিফলন এর মধ্যে অন্যতম। নির্দ্বিধায় তাই বলা যায়, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন মানব মর্যাদা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ।

আজ যেখানে সারা বিশ্বে সার্বজনীন মানবাধিকার চরম হুমকির সম্মুখীন; আন্তর্জাতিক, রাষ্ট্রীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক সন্ত্রাসবাদের কবলে পড়ে মানুষের জীবন যখন একেবারেই তুচ্ছ হয়ে পড়েছে; ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে চরম উচ্ছৃঙ্খলতা, হত্যা-ধর্ষণ, সম্পদ লুণ্ঠন, ঘুষ-দুর্নীতি, অবিচার-অত্যাচার, সম্ভ্রমহানী, মত প্রকাশের স্বাধীনতার অভাব এবং মৌল মানবিক চাহিদার অপূরণ জনিত কারণে মানবতা ও মানবাধিকার যখন চরমভাবে লঙ্গিত হচ্ছে দিকে দিকে- তখন বিশ্ব প্রচলিত মানবাধিকার নীতিমালার সাথে তুলনামূলক গবেষণা বা বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রদত্ত মানবাধিকার ও মানবিক মর্যাদার নীতিমালাই আজকের দিনে গণমানুষের মুক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ পথ ও পন্থা।

---

83 . অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম, "পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদদের নজরে মুহাম্মদ (সা.)", সীরাত স্মরণিকা ১৪১৭ হিজরী, ইফাবা, ঢাকা, পৃ. ৫৬।

84 . প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।